জীবন যে রকম

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এস.ডি.ও-র মস্ত দোতালা বাংলোটি পাহারা দেওয়ার জন্য যে ক'জন হোমগার্ড আউট হাউসে বেডিং সুটকেশ নিয়ে বসবাস করত, তাদের মধ্যে একজন ছিল ভূপতি মান্ডি। বছর চব্বিশ পঁচিশের সুঠাম চেহারার যুবক, বাড়ি গোয়ালতোড় থানার বনকাঁটা গাঁয়ে, রঙ কালো, একটু বেঁটে, চুল কোঁকড়া কোঁকড়া অথচ ছোট করে ছাঁটা। সরল, কিন্তু কাজেকর্মে বেশ চটপটে। হোমগার্ডদের ডিউটি তিনমাস পরপর বদল হয়ে যায়, কিন্তু ভূপতি আমার বাংলোর কাজে বহাল হওয়ার পর এস.পিকে অনুরোধ করে তাকে গত একবছর ধরে রেখে দিয়েছি আউটহাউসে। তার চমৎকার স্বভাবের জন্যই।

অথবা শুধু স্বভাবের কারণেই হয়তো নয়। সে জাতিতে সাঁওতাল। মেদিনীপুরে এস.ডি.ও হয়ে আসার পর থেকে কারণে - অকারণের আমি সাঁওতাদের পাড়ায় যাতায়াত শুরু করেছি তাদের জীবনযাপন, পরবের বৈচিত্র্য ভাল করে জানবার উদ্দেশ্যে। বছরখানেকের চাকরিতেই আমার উপলব্ধি হল, গ্রামের মানুষের যে জীবন - যাপন আমার আশৈশব পরিচিত, আদিবাসীদের জীবনযাত্রা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব এই সম্প্রদায়টিকে আরও গভীরভাবে জানা দরকার। তাইই সাঁওতাল পল্লীতে ঘোরাঘুরি ছাড়াও সকালে - বিকেলে আমার বাংলো চেম্বারের কাজের ফুরসতে ভূপতিকে ডেকে নিয়ে পূর্ণ করতে বসি আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি। কখনও আষাড়ে গল্পের মাঝে জিজ্ঞাসা করি— তোমার হোমগার্ডের চাকরি কতবছর হল ভূপতি?

ভূপতি দাঁড়িয়ে তাকে জড়োসড়ো। এস.ডি.ও মানে এদের কাছে হাকিমসাহেব। এজলাসে বসে বিচার করেন। জেল - জরিমানা-ফাঁসি সবকিছুই দেওয়ার হক আছে হাকিমের। তাঁকে একটু তো ভয় করবেই। তবু হোমগার্ডদের ডিউটি কখনও থানায় , কখনও এস. পি. বা এ. ডি. এমের বাংলোয় হওয়ার সুবাদে হাকিম বা পুলিশ ভীতি এখন কিছুটা কেটে গেছে তার। তবু ওপরওলা তো বটে। হোমগার্ডের চাকরি মানে সেন্ট পার্সেন্ট অস্থায়ী কর্মী। যে-কোনোও মুহূর্তে সাহেবরা ইচ্ছে করলে খতম করে দিতে পারেন রুজি - রোজগারের পথটা। যদিও আমার বাংলোয় পাহারা দিতে আসা আর এক হোমগার্ড রতন জানা আমাকে প্রায়ই বলত, স্যার, আপনি আমাকে বকছেন? আমাদের কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেখানে নালিশ করে দিলে আপনার—

অর্থাৎ কিনা সেও আমার চাকরি নিয়ে কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে দিতে পারে। কী গোলমাল পাকাতে পারে সে সম্পর্কে তার খুব স্পষ্ট দারণা না থাকায় 'আপনার—'বলেই থমকে দাঁড়াত, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতাম দেখে আর কথা না বাড়িয়ে চলে যেত নিজের আস্তানায়। আসলে তাকে না বকে উপায়ও থাকত না। কখনও তাকে কোনও কাজে পাঠালে সে দশমিনিটের কাজ দু'ঘন্টার আগে করে আসতে পারত না।

ভূপতি অবশ্য সরল, সাধাসিধে, খুবই কর্তব্যপরায়ণ। সে তার সাহেবের অনুসন্ধিৎসায় হয়তো অবাক হতো, কিন্তু উত্তর দিত চোখ মাটির দিকে রেখে। ক্রমশ জড়তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল আমার লাগাতার কৌতূহলপ্রবণতায়। সরল হাসিটি উপহার দিয়ে বলত, আমার ঘর সেই লালগড়ের দিকে, স্যার, বাস থেকে পীরকাটা নেমে আর দু-তিনমাইল হাঁটা পথ। গোয়ালতোড় হয়েও যাওয়া যায়।

—জিপে করে যাওয়া যায় তোমাদের গাঁয়ে? এপ্রশ্নে ভূপতি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সাহেব তার গাঁয়ে যেতে চান বুঝে তার মুখে ঘনিয়ে আসে কৌতুক। কিছুটা খুশি - খুশিও দেখায় তাকে। পরমুহূর্তে হতাশ হয়ে বলে, যাওয়া যাবে না স্যার। হাঁটাপথে মাঝে একটা খাল আছে। তার ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে আরও দেড় মাইল। সে আপনি হাঁটতে পারবেন না। তবে একটা ব্রিজ হবার কথা আছে—

অর্থাৎ তার ধারণা, সাহেবরা জিপ থেকে নেমে অত রাস্তা হেঁটে যেতে পারেন না। আপাতত তার টেনশনে জল ঢেলে দিয়ে বলি, না, না, এখনই তো আর যাচ্ছি না; আগে ব্রিজ হোক। আচ্ছা, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—মা - বাবা আছে, বউ আছে, ভাই আছে একটা, তিনটে বোন, ভূপতি গড়গড় করে বলে, ভাই ইস্কুলে পড়ে—

—আর ছেলেমেয়ে?

ভূপতির মুখচোখ লজ্জায় বাদামি বর্ণ হয়, মুখ নিচু করে বলে, এখুনো নাই হয়েছে, স্যার।

তার এত লজ্জা দেখে প্রসঙ্গ বদলে বলি, তাহলে তোমার পরিবার তো বেশ বড়ই। তোমাদের চলে কী করে? শুধু তোমার মাইনের টাকায় নাকি?

—না, স্যার ভূপতির মুখ এতক্ষণে উজ্জ্বল দেখায়, আট-দশ বিঘে ধানজমি আছে। তাতে বছরের ধান ঘরে থাকে। তা ছাড়া আমার দাদার একটা গোরু-গাড়ি আছে, তাতে মাল বওয়া করে সারা বছর। তাতেও একটা বাড়তি রোজগার হয়।

—ও, তাহলে তো গাঁয়ে তোমরা বেশ বড়লোক।

ভূপতি আবার একরাশ সরল হাসি উপহার দেয়।

—কিন্তু, আমি একবার অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি, তোমার নামখানা বেশ, একেবারে আধুনিক না হলেও বেশ গালভরা।

মৃদু হেসে ভূপতি জানাল, জন্মবার পর প্রথমে তার নাম রাখা হয়েছিল ভজহরি। তার দাদুর নামও ছিল ওই। আসলে দাদুর নামে নাম রাখাই হল তাদের রীতি। পরে স্কুলে ভর্তি করার সময় তার বাবা নাম বদলে রেখেছিল পরাশর। হাইস্কুলে ওঠার সময় বাবা আবার নাম বদল করে ভূপতি করে দিয়েছিল।

ক্রমশ ভূপতির সঙ্গে এই ভাবেই একটা সখ্য গড়ে ওঠে আমার। আউটহাউসে কর্তব্যরত অন্য হোমগার্ডদের চেয়ে ভূপতিকেই একটু বেশি ডাকাডাকি করি। তাতে অন্যেরা খুবই খুশি। কারণ তাদের কাজ করতে হচ্ছে কম। ভূপতি অবশ্য অন্যদের তুলনায় আমার কাজ করতে পছন্দ করে বেশি। হয়তো ওর ভেতর এখনও সভ্যতার কূটকচালি তেমনভাবে প্রবেশ করেনি বলেই।

আসলে সভ্যতা ঠিকঠাক প্রবেশ করেনি গোটা সাঁওতাল পল্লিগুলোতেই। বেশিরভাগ পল্লিতেই দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এক চাষবাসই যা ওদের রুজিরোজগারের পথ। কখনও সাবুই গাসের দড়ি বোনে। নিজস্ব জমিজমা আছে সব পরিবারেই। ভাগচাষ করেই দিন গুজরান করতে হয় সবাইকে। আজকাল লেখাপড়ার চল হয়েছে অবশ্য অনেক গাঁয়ে। সরকারের দেওয়া সুযোগসুবিধা ওদের হাত পর্যন্ত না পৌঁছলেও আর পাঁচটা গাঁয়ের মতো সাঁওতাল পল্লীতেও বেলা দশটা বাজলেই স্কুলে যাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

হোস্টেলে থেকেও বহু ছাত্রছাত্রী পড়ছে। স্কুল বা কলেজ থেকে পাশ দিয়ে বেরোতে পারলে কখনও চাকরিও পেয়ে যায় দু'একজন। সে সংখ্যাটা অবশ্য খুবই নগণ্য। সরকার নির্ধারিত কোটার তুলনায় অনেক অনেক কম। ভূপতি অবশ্য যে চাকরি করে তা অস্থায়ী। কিন্তু অস্থায়ী হলেও হোমগার্ডদের চাকরি যে চট করে চলে যাওয়ার নয়, তা ওরা জেনে ফেলেছে এর মধ্যে। তবু সরকারি কোটায় একটা গ্রুপ 'ডি'র চাকরি পেলে তার মাইনে যে আরও তিন-চার টাকা বাড়ত সে খবরও ভূপতি রাখে। তবে তা নিয়ে খুব একটা ক্ষুব্ধ সে, তাও নয়। হয়তো পল্লীর অন্য সাঁওতাল - পরিবারের তুলনায় তাদের অবস্থা একটু সচ্ছল বলেই।

কিন্তু সাঁওতালদের অসাচ্ছল্যও ঢাকা পড়ে যায় তাদের প্রাণোচ্ছল জীবনযাপনে। বারোমাস তারা ব্যস্ত থাকে তাদের পরবের উদ্‌যাপনে। পরবের ক'টা দিন তারা নাচে গানে বাজনা বাজিয়ে এমন হল্লোড় করে যে দারিদ্র্যের রুক্ষ আঙুলের স্পর্শ প্রায়ই তাদের গায়ে লাগতে পারে না। বস্তুত সাঁওতাল জনজীবনের এই দিকটাই সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে আমাকে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা গাঁয়ে গিয়ে বহুরাত পর্যন্ত কাটিয়েছি ওদের পরবের হুল্লোড় দেখতে। একবার তো নাচগান দেখতে দেখতে রাত ভোর করে ফেললাম। কী প্রাণপ্রাচুর্য ওদের! মেয়েরা প্রায় সব্বাই নাচতে গাইতে পারে। ছেলেরা বাজাতে।

কখনও ভূপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসাও করি সে কথা, তুমিও নিশ্চয় মাদল বাজাতে পারো ভূপতি?

ভূপতি লাজুক হেসে মাথা নাড়ে, না?

—দামসা? কিংবা বাঁশি?

আরও লজ্জায় নুয়ে পড়ে ভূপতি, না। ছোটবেলায় দু-একবার বাজিয়েছি। তারপর চাকরি পেয়ে যেতে ভুলে গেছি সব।

জিভে চুকচুক শব্দ করে বলি, ক-দিন সাঁওতালপাড়ায় ঘুরে আমার কিন্তু ধারণা হচ্ছিল গাঁয়ের সব পুরুষরাই মাদল কিংবা ধামসা বাজাতে অভ্যস্ত।

নিজেকে একটুও অপরাধী না ভেবে ভূপতির চটজলদি জবাব, যাদের অনেক জমিজমা আছে, যারা চাকরিতে ঢুকে যায় তাদের বাড়ির পুরুষরা নাচগানের সময় পায় না।

ভিতরে - ভিতরে অন্য একটা কৌতূহল উসকোচ্ছিল এতক্ষণ, কী জানি ওদের কাছে অশালীন মনে হবে কি না, তবু জিজ্ঞাসা করে বসি, আর তোমার বউ? গাঁয়ের আর পাঁচটা মেয়ে-বউ যখন পরবের দিন নাচতে যায়, তোমার বউ যায় না?

ভূপতি অবশ্য সহজ মনেই নিল প্রশ্নটা, হেসে বলল, ফুলমণি খুব ভাল নাচতে পারে। বিয়ের আগে যে-গাঁয়ে থাকত, ও-ই তো ছিল নাচের সেরা।

—তোমার বউয়ের নাম ফুলমণি বুঝি?

— হ্যাঁ, ভূপতি লাজুক লাজুক মুখে বলে, হ্যাঁ আমার বউকে দেখতে খুব সুন্দর তো, তাই ফুলমণি, এখন আমার গাঁয়েও ওর খুব নামডাক।

ফুলমণি ভালো নাচতে পারে, তাকে দেখতেও ভারি সুন্দর জেনে এতক্ষণে খুশিতে ভরে ওঠে আমার ভিতরটা। সাঁওতাল যুবতী নাচতে পারবে, নাচে-গানে রাত কাবার করে দেবে তবেই না তাদের সাঁওতালী জীবন সার্থক। ক-মাসের সাঁওতাল পল্লিতে যাওয়া - আসার সুবাদে তাদের জীবনধারার এই পরিচয়টাই ভারী রোমান্টিক লাগে আমার কাছে।

কাজের অবসরে সুযোগ পেলেই ভূপতিকে ডেকে এনে আরও খবরাখবর নিতে বসি। অন্য-অন্য গাঁ থেকে যে-সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বিশেষ করে ওদের পরবের টুকিটাকি ঝালিয়ে নিতে থাকি ভূপতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে। একদিন এদের বিয়ের রীতিনীতি নিয়েও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। এতদিনে ভূপতি মোটামুটি তার জড়তা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠেছে বেশ। বিয়ের আলোচনা উঠতেই সাগ্রহে জানালো, রায়বারিচের উদ্যোগেই সাধারণত বিয়ের যোগাযোগ হয়ে থাকে সাঁওতাল সমাজে। এই সব ঘটকরাই মেয়ের খোঁজখবর নিয়ে হাজির হয় পাত্রপক্ষের কাছে। তার বর্ণনায় পছন্দ হলে পাত্র তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাত্রী দেখতে যাবে। আসন পেতে মেয়ে দেখানোর রীতি নেই ওদের সমাজে। মেয়ে আসবে জলের গেলাস বয়ে। হাতে হাতে জল তুলে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করবে সবাইকে। তবে খাবার খাওয়ানোর প্রথা নেই। মেয়ে দেখে পছন্দ হলে তবেই পাত্রের বাবা-মা বা আত্মীয়স্বজনেরা আসবে। তারপর পাত্রীপক্ষ যাবে পাত্রের বাড়ি। উভয়পক্ষের সম্মতি হলে তবেই দিনস্থির হবে বিয়ের। কনেপণ হিসেবে পাত্রকে দিতে হবে সাত বা একুশটি টাকা, সঙ্গে একটি বা দুটি গাই-গরু (বাছুর)।

এরপর ভূপতি আরও আশ্চর্য করল আমাকে এই বলে যে, কনেপক্ষকে শুধু পণ দিতে হয় না তা নয়, ভোজও খাওয়াতে হয় না বরযাত্রীকে। বরং বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বরপক্ষকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় চাল-ডাল-তেল-মশলা। কনেবাড়ির কাছাকাছি কোনও বড় গাছের নীচে উনুন তৈরি করে আয়োজন করে রান্নার। তারপর পাতা বিছিয়ে সেখানেই বরপক্ষের খাওয়াদাওয়া চলে।

তবে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম হলে অন্য কথা।

সেই প্রসঙ্গেই আমি উৎসাহিত হই, কিন্তু ভূপতি সেই আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে তুলল ওর বিয়ে করে ফেরার অভিজ্ঞতা। ওর শ্বশুরঘর থেকে ফেরার পথে সাতখানা গাঁ পার হতে হয়। প্রতিটি গাঁয়েই বর-কনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের মেয়েরা ছুটে এসে ঘিরে ধরেছিল তাদের। তারপর নাচগানকরে কত মস্করা। শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করে তবে ছাড়া পাওয়া যায় পরের গাঁয়ের দিকে এগোবার।

এর আগেই একটু একটু পরিচয় ঘটেছিল সাঁওতালী - ভাষার সঙ্গে। মেদিনীপুরে এসে সুযোগ পেতেই ভর্তি হলাম ঝাড়গ্রাম শিক্ষাকেন্দ্রে। নতুন একটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানেই এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা ঝালিয়ে নিতে আবারও শরণাপন্ন হতে হয় ভূপতি মান্ডিরই । টুকটাক কথা বলি ওর সঙ্গে এই নতুন ভাষায়।

হয়তো কখনও ভূপতি এসে বলল, স্যার বাইরে একজন এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভূপতিকে চমকে দিয়ে বলি উনি দা ভিতরি তে হিনুক মেতায় মে (অর্থাৎ তাঁকে ভেতরে আসতে বলো)।

কখনও শীতের দিনে গায়ে শাল জড়াতে জড়াতে বলি, ভূপতি, দেহেদ আড্ডি রাবাং কানায় (আজ বড্ড শীত)।

ভূপতি প্রথম - প্রথম একটু অবাক হতো, তারপর ক্রমশ তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সরল হসিতে । সেও একদিন জিজ্ঞাসা করল, সাঁওতাল আড়াঙ চেদাক্ এম্ সেঁড়ায়েদা (সাঁওতালী ভাষা কেন শিখছেন)?

আমি ভেবেচিন্তে জবাব দিই, হড়বয়হাকো সাঁওসানথালিতে রড় লোগিৎ (সাঁওতাল ভাইদের সঙ্গে সাঁওতালীতে কথা বলার জন্যে)।

সাঁওতালী ভাষা শেখার এই অভিজ্ঞতা মাঝে মধ্যে অন্য চকমও দিতে লাগল আমার চাকরি জীবনে। আগে লক্ষ্য করতাম

সাঁওতাল গাঁয়ের সাধারণ মানুষ আমাকে দেখে ভিনদেশি' বলে সবসময়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলত। আজকাল গাঁয়ে ঢুকে যেইমাত্র দু-চারটে সাঁওতালী ভাষায় কথা বলি, অমনি দেখি বদল হয়ে যাচ্ছে তাদের চোখমুখ। তৎক্ষণাৎ আমাকে তাদেরই একজন মনে করে তাদের ভাষায় এমন হুড়মুড় করে অভাব - অভিযোগের কথা বলতে শুরু করে যে, তখন আমিই বিপন্ন। এখনও এত ভালভাবে তো রপ্ত হয়নি ভাষাটা। তাদের অন্তত চল্লিশ শতাংশ কথা আমার কাছে তখনও দুর্বোধ্য। তবু বেশির ভাগটাই তো বোঝা যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে আমার অফিসারি - ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তৈরি হয় এক নিবিড় সম্পর্ক। আমার চোখের সামনে তখন ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে এক অন্য পৃথিবীর রূপ। সে এক আশ্চর্য, অন্য উদঘাটন। যে - পৃথিবী আমাদের চেনা অথচ চেনা নয়, দেখা অথচ দেখা নয়।

বাংলোয় ফিরে সেই অভিজ্ঞতা আবার ঢালা - উপুড় করি ভূপতির সঙ্গে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ভারী উদ্বিগ্ন দেখায় ভূপতিকে। জিজ্ঞাসা করতে ইতস্তত করে জানায় তার স্ত্রী গর্ভবতী, সবে তিনমাস, শহরে এনে ডাক্তার দেখাতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে বলি, তা বেশ তো, নিয়ে এসো। হাসপাতালের ডাক্তারকে ফোন করে দেব'খন।

কিন্তু ভূপতির অসুবিধে এই মফস্বল শহরে তার এমন কোনও বাসস্থান নেই যেখানে রাখতে পারে ফুলমণিকে। সাহেব যদি অনুমতি করেন তাহলে এই আউটহাউসেই তাকে রাখতে পারে ক-টা দিন। আউটহাউসে দুটি ঘর, তারই একটিতে—

দুই হোমগার্ডের জন্য পাশাপাশি দুটি ছোট ছোট ঘর, তাতে যদি ওরা মানিয়ে থাকতে পারে, তাতে আমার কী অসুবিধে!

ভূপতি হঠাৎ লজ্জা লজ্জা স্বরে বলে, স্যার ফুলমণির খুব ইচ্ছে আপনাকে একবার চোখে দেখে। ছুটিতে বাড়ি গেলেই আপনার গল্প করি ওর সঙ্গে। আপনি বই লেখেন শুনে ফুলমণি তাজ্জব। বই লেখে এমন মানুষ কখনও চোখে দেখেনি তো।

ভূপতির কথায় আমিও কিছু কম তাজ্জব নই। ব্যস্ততার মধ্যেও সারা দিনে যা দু-এক ঘন্টা ফুরসত পাই সে সময় রোজই দু-চার পৃষ্ঠা লিখে ফেলি কলকাতার পত্রপত্রিকায় অনুরোধ রাখতে। কিন্তু কী লিখি তা ভূপতির জানার কথা নয়। তবে আমার টেবিলে পড়ে থাকা আমার লেখা একটি বই উল্টে পাল্টে দেখছিল একদিন তা চোখে পড়েছিল আমার। কিন্তু সে কাহিনী পৌঁছে গেছে বনকাঁটা গাঁয়ের এক সাঁওতাল যুবতীর কানে, সেই যুবতী আমাকে দেখতে চেয়েছে আমি 'বই লিখি' বলে তা এক আশ্চর্য ঘটনা।

ভূপতির সঙ্গে কথায় - কথায় জানতে পারি সে নিজে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়লেও তার বউ ফুলমণি মাধ্যমিক পাশ করে ইলেভেন পর্যন্ত পড়েছে। সে নাকি লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই এনে নিয়মিত পড়ত বিয়ের আগে। তারপর বিয়ে হওয়ার পর ঘরকন্নার কাজে এতই ব্যস্ত যে বই পড়ার কোনও ফুরসতই নেই এখন।

ফুলমণি গল্পের বই পড়ত এ-বিষয়টি আমার সাঁওতালপ্রীতিতে এক নতুন সংযোজন। ক্লাস ইলেভেন পর্যন্ত পড়া এক সাঁওতাল যুবতীর কোনও লেখককে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে জেনে তাকে দেখতেও আমার ইচ্ছে হয় খুব। গত কয়েক মাস সাঁওতালপল্লীতে গিয়েছি সাঁওতাল মেয়েদের নাচের ছন্দ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাদের গানের সুরে দোলা লেগেছে আমার মনেও। এমনকি হাসি হাসি মুখে এনে দেওয়া জলের গেলাসও নিঃশেষ করেছি, কিন্তু তাদের সঙ্গে খোশগল্প করার কোনও সুযোগ ঘটেনি এত দিনও।

ফুলমণি যখন লেখাপড়া জানা মেয়ে, তার সঙ্গে গল্প করার বাসনাও জেগে উঠল হঠাৎ।

ভূপতি সেই সপ্তাহের শনিবার বাড়ি গেল ফুলমণিকে আনতে। দিনদুয়েক পরে কথামতো ফিরে এল সে, কিন্তু একা। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেই জানাল, ফুলমণি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে এ সপ্তাহে আসতে পারল না। পরের সপ্তাহে—

কিন্তু পরের সপ্তাহেও আসা হল না, আরও একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। কী তার অসুস্থতা তেমন খোলসা করে ভূপতি না বললেও বুঝতেপারি, বউয়ের জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বললাম, ডাক্তার দেখাচ্ছ তো ওখানে, ভূপতি?

ভূপতি ঘাড় নাড়ে, দেখাচ্ছি, স্যার।

—তাহলে বরং কদিন ছুটি নাও। অসুস্থ বউ বাড়িতে ফেলে রেখে এখানে পড়ে আছে—

কিন্তু বলা হত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। একজন হোমগার্ডের ডিউটির শর্তই হল, নো ওয়ার্ক নো পে। এখন ছুটি নিলে সে তো মাইনেই পাবে না। অথচ অসুস্থ ফুলমণির জন্য তার এখন টাকার খুবই দরকার।

তিন-চার সপ্তাহ এমন কাটার পর একদিন ভূপতি এসে কুণ্ঠিত মুখে জানাল, সে গোয়ালতোড় থানায় ডিউটি পাচ্ছে। যদি সাহেব তাকে এস.ডি.ও -বাংলোর ডিউটি থেকে ছুটি করে দেন তো গোয়ালতোড় থানায় ডিউটি নেবে সে। তাতে বাড়ি থেকে রোজ যাতায়াত করতে পারে থানায়।

কেন কে জানে, বুকের ভিতরটা একটু চিনচিন করে উঠল। ক'মাসেই ভূপতির সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার। চারপাশের এত সব মানুষের মধ্যে সে ছিল আমার অন্য একটা দ্বীপ। কিন্তু ভূপতির প্রার্থনায় অরাজি হলে সেটা হবে খুবই অনুচিত কাজ। আমার স্বার্থের জন্য কেনই বা সে তার পরিবার - পরিজন ছেড়ে এত দূরে পড়ে থাকবে। তৎক্ষণাৎ তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, সে তো ভাল কথা। আমি আজই এস.পি-কে বলে দিচ্ছি—

পরদিনই ভূপতি আমার বাংলোর বাস উঠিয়ে চলে গেল গোয়ালতোড় থানার ডিউটিতে। যাওয়ার সময় বলে্ দিয়েছিলাম, পরে একটা খবর দিও, ভূপতি।

দিন কয়েক পরে আমারও মনে হয়েছিল, একবার গোয়ালতোড় থানা থেকে খবর নিলে হতো, ওর বউ ফুলমণি কেমন আছে। যাব যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি শেষপর্যন্ত। একমাস পার হল, দু'মাস। তারপর সরকারি চাকরির কল্যাণে কিছুদিন পরে আমারও বদলির আদেশ হল, আমারই প্রার্থনা অনুযায়ী কলকাতায়।

ভূপতির সঙ্গে দেখা হয়নি আর। ফুলমণির সঙ্গেও। ঘরেতে আসেনি সে, তবু মনে তার নিত্য আসা - যাওয়া। সেই এক সাঁওতাল যুবতী, যে কিনা একজন বই - লিখা মানুষকে দেখতে চেয়েছিল, তাকেও, কি জানি কেন, আমরও দেখা হয়নি বলে আপশোষ হচ্ছিল যাওয়ার দিন।